

নজরুল বিদূষণে ‘প্রবাসী’ ও ‘শনিবারের চিঠি’

মিঠুন দত্ত

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/8_Mithun-Datta.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের অতি আধুনিকতাকে বিরোধিতা করতে জন্ম হয় ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার। সেই পত্রিকার হাত ধরে ‘প্রবাসী’র উত্থান। এই দুই পত্রিকার উদ্দেশ্য নজরুল ইসলামকে কটাক্ষ করা। চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠী ও মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের মধ্যে প্রধান। তাঁরা নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবনকে নানা ভাবে সমালোচনা করে তাঁকে সাহিত্য সমাজে কীভাবে আরো বেশি পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে সেই দিকটি তুলে ধরেছে এই প্রবন্ধ। সেই ক্ষেত্রে সমালোচকদের প্রচেষ্টা এবং নজরুল ইসলামের প্রতিহত করা ও হওয়া দিকটি বিস্তারিত ভাবে উঠে এসেছে।

সূচক শব্দ: বিদূষণ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, কল্লোল, প্যারোডি।

১

‘রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর’^১ বয়ে আনাই ছিল ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ যুবক গোষ্ঠী ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যকে পাঁকে পরিণত করে। তাঁদের সাহিত্যে উন্মুক্ততা, জীবন যন্ত্রণা, সমাজ ভাঙ্গন, জটিলতা ও প্রবল যৌন বিষয় স্থান পেতে লাগল। কল্লোলের সাহিত্যে এতদিনকার মূল্যবোধ রক্ষার মাপকাঠি পেরিয়ে পঙ্ক পা দিলো। এই অতি আধুনিকতার বিরোধিতা করে আরেক দল তরুণ গোষ্ঠী জন্ম লাভ করল; যাঁদের একমাত্র আশ্রয় হলো ‘শনিবারের চিঠি’ (১৯২৪ / ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। তাঁদের বক্তব্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে রক্ষণশীলতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও স্থূল ইতরতা প্রকাশ পেয়েছে। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আধুনিক লেখকদের কাছে নির্ভরযোগ্য ‘বনস্পতির বৈঠক’। মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন এই পত্রিকার হোতা। সজনীকান্ত দাস ছিলেন তাঁর সেনাপতি এবং তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ‘বৃহস্পতি গুরু’। এই পত্রিকায় রঙ্গ-ব্যঙ্গ দ্বারা নজরুল ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়েই মোহিতলাল মজুমদার ও সজনীকান্ত দাসের কাছাকাছি আসা এবং তাতেই একটা সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে।

২

এই সময় ‘শনিবারের চিঠি’ আবির্ভাবের কারণ ও লক্ষ নির্দেশ করে ‘শনিবারের চিঠি’ প্রবর্তক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে লিখেছিলেন — “রবীন্দ্র-যুগে ভারতীয় সভ্যতার নবজীবন লাভ ও সংস্কৃতি সাহিত্যের মহাযুগের আদর্শগুলিকে নূতন প্রাণ দান করিবার চেষ্টা শুধু সাহিত্যে আবদ্ধ ছিল না, চিত্রকলা সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতিতেও সেই প্রগতি প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই যুগের বক্ষেই জন্ম লইয়া বহু নির্বীণ লেখক কষ্টকল্পিত ও কৃত্রিম প্রেরণায় অনুভূতির অভিনয় করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে এক সময় সত্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে অতি নিম্নে নামাইয়া দিয়াছিলেন। সেই একই সময়ে আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা মধ্যে বহু নিম্ন স্তরের বিদেশী উপ-আদর্শ আসি পড়িয়া জীবন-প্রবাহের স্বচ্ছ ভাব নষ্ট করিয়া সকল কিছুই ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছিল।... শনিবারের চিঠির অভিযান আমাদের জীবন প্রবাহকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সত্য আকাঙ্ক্ষার পথে চলাইবার জন্য আরম্ভ হইয়াছিল।”^২ ‘শনিবারের চিঠি’র প্রথম দিক্কার উদ্দেশ্য আধুনিক সাহিত্যের সূচনা লগ্নে কল্লোল গোষ্ঠীর বিরোধিতা করে সাহিত্যে ও সমাজে রক্ষণশীলতা রক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে ‘শনিবারের চিঠি’ গোড়ায় প্রকাশ পেয়েছিল চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর পারিবারিক মুখপত্র হিসেবে। ‘শনিবারের চিঠি’র উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, সাহস, শক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বহু মনীষী প্রশংসা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত নবীন ও প্রবীণ

লেখকদের একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ‘বনস্পতির বৈঠক’ হয়েছিল ‘শনিবারের চিঠি’। তাঁর কাছে প্রণতি ও ফরিয়াদ নিবেদন করে চিঠি দ্বারা অভিনব উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গিক অভিযান চালিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিকে তাঁদের সহায় হলেও তিনিই তাঁদের সমালোচনার চলে আসে। তার কারণও নজরুল ইসলাম।

৩

নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল ১৯২০ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায়। সময়টা আনুমানিক শ্রাবণ ১৩২৭ থেকে ভাদ্র ১৩২৭ এর আগে হবে। সেই সময় নজরুল ইসলামের বয়স ২১ এবং মোহিতলাল মজুমদারের বয়স ৩২।^১ মোহিতলাল মজুমদার বড়ো হয়েও নজরুলের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেন ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায়। তাই ৮/এ, টার্নার স্ট্রিটে মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে থাকাকালীন নজরুল বন্ধুদের অনুরোধে মোহিতলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান আমহার্স্ট স্ট্রিটে। নজরুলের সঙ্গে গিয়েছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সেই দিন মোহিতলাল নজরুলকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে ‘প্রবাসী’তে নজরুল তাঁর লেখা ছাপবে না। নেবুতলার ক্যালকাটা হাইস্কুলের শিক্ষক মোহিতলাল নজরুল ইসলামকে ‘কালী সাহেব’ সম্বোধন করলেও মন থেকে নজরুলকে অনুগত ছাত্র হিসেবে চাইত। এই দিকে নজরুলের বাড়ি স্থানান্তরিত হয় তালতলা লেনে। সেখানে ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার সময় শ্বশুরবাড়ি ব্যারাকপুর থেকে কবিতা শোনাতে আসে মোহিতলাল মজুমদার। নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতার প্রশংসা না করলে তিনি খুব মর্মান্বিত হন। সেখান থেকে মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের ফটল ধরতে থাকে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বড়োদিনের ছুটিতে নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা করলো। ‘বিদ্রোহী’ নজরুল ইসলামের আত্মসম্মান এবং আত্ম আবিষ্কারের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে প্রথম এই কবিতা বাংলার যুবকদের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল হয়। সেই কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুজফ্ফর আহমেদের মতো অনেক সমকালীন পণ্ডিত মানুষ। কবিতাটি লেখার আনুমানিক সাত থেকে দশ দিনের মাথায় প্রথম ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকাতে। তাতেই নজরুলের বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা^২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন রাতারাতি প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০), মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ’ (১৮৬২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুর্গেশ নন্দিনী’ (১৮৬৫)র, পাশাপাশি নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। পরে রক্ষণশীল পত্রিকা ‘প্রবাসী’তে সেই কবিতা পুনর্মুদ্রিত হলে মোহিতলালের সঙ্গে প্রবাসীর বিরূপতা আরো বৃদ্ধি পায়। প্রবাসীর পরিচালকদের উদ্দেশ্যে তিনি ‘মর্কট’, ‘বিটকেল’ এবং নানা রকম অশালীন শব্দ ব্যবহার করতেন।

এই ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের লড়াই সকলের সামনে প্রকাশ পায়। এই দিকে ‘প্রবাসী’তে নজরুলের লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এককালের ‘প্রবাসী’ বিরোধী ও নজরুল সুহৃদ কবি মোহিতলাল মজুমদার এই সুযোগে ‘প্রবাসী’ গোষ্ঠীতে ঢুকে পড়েন। যে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় নজরুলকে লেখা ছাপতে মানা করে সেই ‘প্রবাসী’র দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। তার পাশাপাশি ‘শনিবারের চিঠি’র পরিচালকেরাও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে বৈঠকে বসতেন। যদিও ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্ত দাস এবং ‘প্রবাসী’র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও যোগানন্দ দাসের সঙ্গে মোহিতলালের বয়সের ফারাক প্রায় ১০-১২ বছরের। প্রত্যেকের প্রথম ও প্রধান ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য কাজী নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার ২৭, বাদুড়-বাগান লেনের একই বাড়িতে সজনীকান্ত দাস ও মোহিতলাল মজুমদার থাকতেন। ‘প্রবাসী’র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ নজরুলের প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিয়ের (২৪ এপ্রিল, ১৯২৪) পরই ব্রাহ্মণরা তাঁর উপর ক্ষেপে গেল এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁকে সমালোচনা করে লিখেছিলেন। আর নজরুল বিরোধিতার জন্যেই ‘প্রবাসী’ থেকে ‘শনিবারের চিঠি’র জন্ম হয়। ‘প্রবাসী’ প্রকাশের বিরানব্বই দিনের মাথায় ১৯২৪ সালের ২৬ জুলাই (১০ শ্রাবণ, ১৩৩১) এ প্রথম ‘শনিবারের চিঠি’

প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগানন্দ দাস প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের খ্যাতির বিপক্ষে মন্তব্য করেন। বস্তুত শনিবারের চিঠি যে প্রথম থেকেই নজরুলকে তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে সজনীকান্ত দাসের লিখনীতে — ‘রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম... সাপ্তাহিক ‘শনিবারের চিঠি’র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রশ্মিপথেই আমি ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম।’^৬

সজনীকান্ত দাসের ‘শনিবারের চিঠি’তে (প্রথম দিকে সাপ্তাহিক) আত্মনিয়োগের (অষ্টম সংখ্যা থেকে) আগে প্রথম চারটি সংখ্যাতে নজরুলকে ব্যঙ্গ করে কবিতা ছাপা হয়েছিল। প্রথম সংখ্যাতে (১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১, ইং ২৬শে জুলাই, ১৯২৪) শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ‘গাজী আব্বাস বিটকেল’ ছদ্মনামে লিখেছিলেন একটি ব্যঙ্গ কবিতা — ‘প্রলয়ের ফুলকি’। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ এবং ভাষাভঙ্গিকে আক্রমণ করে কবিতাটি লেখা হয়েছিলো —

‘ঘরে বাঁধা সারাদিন নিধিরাম সর্দার।
ফস্ করে ফেঁসে গেল আবরণ পর্দার।
কিল-চড় ফটাফট লাফ-ঝাঁপ দুড়দার
পরায়ণ বাঁধিতে চাও যদি তো, খবর দার।
নাড়ি ভুড়ি ফেড়ে ফুরে ফুঁ দিয়ে ফটকায়,
কাটা মাথা ফুটবল কচি ঘাড় মটকায়।’ ইত্যাদি

ওই সংখ্যাতেই একই ছদ্মনাম হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘ঝাড়ের চাউনি’। একই ভাব, একই ভঙ্গি —

‘আমি দড়ি ছেঁড়া গরু, তাই গলা সরু,
আমি গলা ভাঙা গাধা, তাই গলা সাধা।’

‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় সম্পাদক যোগানন্দ দাস (১৩৩১ থেকে ১৩৩৪ ভাদ্র-পৌষ) এর মতো অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ‘তোমাদের প্রতি’ কবিতায় আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের কঠোর তিরস্কার করেছেন। আধুনিকদের ‘আর এক wing’ নজরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন —

‘আজি এই বৃষ্টিহীন তিমির দিবসে
উদিত হও গো বীর বিদ্রোহের নব্য বীররসে...
চিকিৎসিতে প্রেতিনী রোগিণী।’

‘মৌলা দোপেঁয়াজী’ ছদ্মনামে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন —

‘লোম হর্ষণ! খুব কম দাম!! লোম হর্ষণ!!!’

কবি জগতের ভরা বাদর, অন্তঃসলিলা ফল্লু নদী, ভাব জ্ঞাতের বে অব্ বিস্কে, বাংলার বৈদ্য কুলপতি, ছন্দোরাঙ্গের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, মহাপ্রাণ, কেয়ারী রঞ্জনের প্রলয় দহন জ্বালা নিবারণী কাজ। সব জায়গায় পাওয়া যায়। সাপ্তাহিক দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩১) হেমন্তবাবু বেনামা কবিতা ‘আনন্দ ভৈরবী’, ‘গাজী আব্বাস বিটকাল’ ছদ্মনামে যোগানন্দ দাসের ‘বিরহের ঠিমিকি’ নামে কবিতা এবং তৃতীয় সংখ্যায় (২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩১) প্রকাশিত হয় ‘জাতীয় কবি গাজী আব্বাসের চিঠি’ নামক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ রচনাটি। ‘শনিবারের চিঠি’র চতুর্থ সংখ্যার পর গাজী আব্বাস বিটকালকে মোহরমের গোঁয়ারায় আগুনে পুড়িতে হাসপাতালান্ত করা হয়। পঞ্চম সংখ্যায় তিনি ‘খেউড়’ এ ‘কল্লোল’এর তরুণ লেখকদের ‘রাস্তার আবর্জনার মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া একজোড়া সস্তা মেলার মাল’ বলে উপহাস করেছেন।

এরপর ‘শনিবারের চিঠি’ জীবনের নানা ক্ষেত্রে ‘বেগোসিটি’র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও আপাতত কিছুদিন নজরুলকে নিয়ে রঙ্গা-ব্যঙ্গ বন্ধ ছিল। পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় ‘আবাহন’ নামে প্রকাশিত কবিতাটির রচয়িতা

ছিলেন 'ভবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে সজনীকান্ত দাস। কবিতাটি ছিল —

‘ওরে এই গাজি রে

কোথা তুই আজি রে

কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।...

মজলি যে কত হিয়া

ব্যাথার দানেত্তে কত হৃদি দ্বার খুলিলি।’ ('শনিবারের চিঠি', ২৮ ভাদ্র, ১৩৩১)

একাদশ সংখ্যায় 'শ্রী কেবলারাম গাজনদার' ছদ্মনামে সজনীকান্ত দাস 'কেফিয়ৎ' হিসেবে সত্য কথাই প্রকাশ করেছিলেন —

‘ধান ভানতে শিবের গীত

গাইছি মোরা নিতি নিতি

মই চালিয়ে সমান করি পরের পাকা ধান

নাই কোন কাজ, পাই নাকো লাজ, বেসুরে গাই গান।...

সখ মেটাতে মোদের শুধু খেয়ালীদের গান।’

পূজা সংখ্যা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি বীর' নামে 'বিদ্রোহী'র প্যারোডি ছাপা হয়। এটি যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের যৌথ উদ্যম। তাঁরা এই কবিতায় ছদ্মনাম ব্যবহার করেন 'শ্রী অবলা নলিনীকান্ত হাঁ, এম, এ, এ জেড' লক্ষণীয় নজরুলের বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কবিতাটি হলো —

‘আমি বীর

আমি দুর্জয়, দুর্ধর্ষ, রুদ্র, দীপ্ত, উচ্চশির।...

হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিলি খেলি

লাখ লাখ তরুণীর।

আমি বীর।’ (১৮ই আশ্বিন, ১৩৩১)

এই সংখ্যায় 'কামস্ফটিকীয় ছন্দে' সজনীকান্ত দাসের 'ব্যাঙ' কবিতাটি ছাপা হয় বিদ্রোহীর প্যারোডি।

‘আমি ব্যাঙ

লম্বা আমার ঠ্যাঙ

ভৈরব বড় বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাং গোর গ্যাং।’

‘আমি ব্যাঙ’ দিয়ে শুরু করল হঠাৎ ব্যাঙ সাপ হয়ে গেল —

‘আমি সাপ, আমি ব্যাং গেরে গিলিয়া খাই

আমি বুক দিয়া হাঁটি হাঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।’

এইসব প্যারোডির কারণ ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ওই বৎসরেই মাঘ মাসের সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটি রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা ছন্দে নতুন সুর। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রশংসা করেন এবং তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।^৫ 'শনিবারের চিঠি'র দলের এটি ভালো লাগে নি। তাঁরা বিপরীত প্রতিক্রিয়া করলেন। সজনীকান্ত দাস ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পাঠ করলেন। তা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যক্ষ প্রশংসা করলেও পরোক্ষ তিনি এই কবিতার ছন্দ ভাবের সফলতা স্বীকার করলেন।

আসতে। পাঁচসিকা দিয়ে তাঁর ‘স্বপন পসারী’ কাব্য কিনে তার মধ্যে ‘পুরুবা’ কবিতা উচ্চস্বরে পাঠ করলেও মোহিতলাল সজনীকান্ত দাসের প্রতি আকর্ষিত হন নি। কিন্তু যে দিন সজনীকান্ত দাস নজরুলকে ব্যঙ্গ করে লেখা ‘ব্যাঙ’ প্যারোডির পাঠ শুনে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। মোহিতলাল মজুমদার ‘শনিবারের চিঠি’র দলে আসার পিছনে আছে সজনীকান্তের ‘ব্যাঙ’ কবিতাটি। সজনীকান্ত দাস ‘আত্মস্মৃতি’ ১ম খণ্ডে লিখেছেন — কামস্ফাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’কে ব্যঙ্গ করিয়া একদিন ‘ব্যাং’ লিখিয়া ফেলিলাম।... একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্ফাটকীয় চন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া ‘আমি ব্যাঙ’ পাঠ করিতেছিলাম, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।... তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই বিদ্রোহীর প্যারোডি কানে প্রবেশ করিতে আত্মবিস্মৃতভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছিল।^১ তাঁর ‘ব্যাঙ’ কবিতা ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায় ১৮ আশ্বিন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলো। মোহিতলাল মজুমদার ‘ব্যাঙ’ কবিতা বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর লেখা ‘শনিবারের চিঠি ও আমি’ প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মাঝে মাঝেই তাঁদের বৈঠকে বসতেন এবং যেই শনিবারের চিঠিকে ‘বিটকেল’ ও ‘মর্কট’ বলে তাচ্ছিল্য করত তাঁদের সঙ্গেই আবার ভাব হয়ে যায়। এই সমস্তটাই নজরুল বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে। এমনকি নজরুল ইসলামকে নিয়ে ‘সত্যসুন্দর দাস’ ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন।

‘কল্লোল’ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর ‘রজনী হল উতলা’ গল্প, আষাঢ় সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘গাব আজ আনন্দের গান’ কবিতা, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যুবনাস্বের গল্প ‘পটলডাঙার পাঁচলী’, ফাল্গুন সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’ কবিতা প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি ‘কালি কলম’ পত্রিকায় নজরুলের দুটি বিতর্কিত কবিতা ‘মাধবী প্রলাপ’ (জ্যেষ্ঠ) ও ‘অনামিকা’ কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে মোহিতলাল ‘শনিবারের চিঠি’র বিভিন্ন সংখ্যায় নজরুলের বিভিন্ন কবিতার বিরূপ সমালোচনা করেন। কারণ মোহিতলাল একদিন নজরুলকে তাঁর ‘আমি’ শীর্ষক রচনাটি শুনেছিলেন। তারপর ‘মানসী’ পত্রিকায় নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশ হলে মোহিতলাল অভিযোগ তুলল যে, নজরুল তাঁর ‘আমি’ রচনার ভাব চুরি করেছেন, কিন্তু তা নজরুল স্বীকার করেন নি। ফলে মোহিতলাল নজরুলের ‘অনামিকা’ কবিতার সমালোচনায় ‘এই লেখকই (নজরুল) বর্তমান যুগের কবি বা Representative Poet-ইনিই তরুণের মুখপাত্র। কবিতাটির নাম ‘অনামিকা’। কবি প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ ‘নামহীন’, তাহার কারণ তাঁহার কামত্বা কোনো নাম নিদিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে।... এ বিষয়ে তিনি এক রকম Pan মৈথুন — ist।’ লক্ষণীয় সমালোচনা এখানে একান্তই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। নজরুলের বন্ধুরা ভাবলেন এর একটা জবাব দেওয়া দরকার। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ থেকে জানতে পারা যে, ‘কল্লোলের অফিস’এ বসিয়ে নজরুলকে দিয়ে ‘সর্বনাশের ঘটনা’ লেখালেন। মোহিতলালের উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতাটি ‘কল্লোল’ পত্রিকায় কার্তিক সংখ্যায় ১৩৩১ সালে ছাপা হয়। পরে এই কবিতাটি নজরুলের ‘ফণীমনসা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সাবধানী ঘটনা’ নামে পরিচিত হয়। তিনি বলেন —

‘রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
 বুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেয়া!
 হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
 দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
 শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি
 অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্যতার গ্লানি!
 তোমার নীচতা, ভীৰুতা তোমার, তোমার মনের কালি
 উদগার গুরু শিষ্যের শিরে; তব বুক হোক খালি!...’

এই কবিতায় প্রথম নজরুল ইসলাম মহাভারত থেকে উপমা ‘সর্বনাশের ঘটনা’ শুরু করে। তিনি মোহিতলালকে ‘দ্রোণাচার্য’ এবং নিজেকে তাঁর শিষ্য বলেছেন।

মোহিতলাল নিজেকে দ্রোণগুরু ধরে নিয়েই তার জবাব দিয়েছে। তাতে সজনীকান্ত দাসকে তুলনা করেছেন অর্জুনের সঙ্গে। মোহিতলাল ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে জবাব দেন ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকায়। সেখানে তিনি নজরুলের বিরুদ্ধে উত্তরে লেখেন ‘দ্রোণ-গুরু’ কবিতা; তা ৮ই কার্তিক, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ‘বিশেষ বিদ্রোহী সংখ্যা’র ক্রোড়পত্র (দ্বাদশ সংখ্যা) কবিতাটি ছাপা হয়। ‘দ্রোণ-গুরু’ তার কবিতায় শিষ্যকে অভিশাপ দিয়েছিলেন নিম্নরূপ —

‘উন্মাদ--তুই উন্মাদ ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদেষ উথলি’ উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ !
আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাঙে মাছি ওঠে ভন্ ভনি !
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে’
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে’
আমি ব্রাহ্মণ, বিদ্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর
অধঃপাতের দেবী নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর !...’

মোহিতলাল এই ক্ষেত্রে সংযমতার কোনো তোয়াক্কা করেন নি। নজরুলকে তিনি ‘হীনজাতি-চোর’ আর নজরুলকে যারা ‘বিদ্রোহী’ কবিতা জন্য সম্বর্ধনা জানিয়েছিল তাদেরকে ‘মর্কট ও ইতর’ এবং জনগণকে তিনি ‘গড্ডলিকা’ বলেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য যে নজরুল ইসলামের ‘সর্বনাশের ঘণ্টা’ ‘ফণি মনসা’ কাব্যে ‘সাবধানী ঘণ্টা’ নামে এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদারের ‘দ্রোণ-গুরু’ কাব্যগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে (১৩৩১ সালে ১৫ই কার্তিক) শনিবারের চিঠিতে ‘চামার খায় আম’ বেনামীতে সমগ্র নজরুল সাহিত্যকে ‘চানাচুর’ আর ‘কাকড়ার ঠ্যাং’র সঙ্গে তুলনা করে বিশ্রী সমালোচনা করে যেতে লাগলেন। লক্ষণীয় যে অপ্রকাশিত মোহিতলালকে দলে পাওয়া ও সজনীকান্তকে ‘অর্জুনের সম্মান’ দেওয়ায় (দ্রোণগুরু কবিতায়) এতদিনের রঞ্জব্যাজা, ঠাট্টা, তামাশা হয়ে দাঁড়াল ক্রুদ্ধ হুংকার, ব্যক্তিগত বিদেষ এবং উদ্দেশ্যমূলক অভিযানের সূত্রপাত। সজনীকান্ত ‘গাজী আব্বাস বিটকেল’ নামে ‘মসী বিদ্রোহ’ কবিতা লিখলেন —

‘কবিতায় বিদ্রোহ, বিদ্রোহ কবিতাই
কলমেতে আঁকি যাহা, বিদ্রোহ ছবি তাই।
বিটকেল শব্দের শুধু রবে ঝঙ্কার
অর্থ না থাকে থাক, আরে তো রে, টংকার।’

‘সহিম-ই-ত্যাগি বোররাক’ ছদ্মনামে অশোকবাবু ‘বিজয় হেবা’ —

‘ক্ষেপল আজি ক্ষেপল ঘোড়া দুটু ঘোড়া ক্ষেপল রে।
হো হুঁসিয়ার সামনে ওয়ালা হো।...’

‘শ্রী ক্ষীগেন্দ্র ধ্রুপদ গায়’ নাম নিয়ে যোগানন্দ লিখলেন ‘শুয়োবাণী’ —

‘হুল ফেটানো সোপোকা কি দেখচ ?
বাংলা ভাষায় তাই গান কি দেখেচ ?...’

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়-মোহিতলাল-নজরুল সংঘর্ষকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঢঙয়ে রূপ দিলেন ‘ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সম্বাদ’ কবিতায়,

‘হেনকালে মহারাজ দেখ এক কাণ্ড
কোথা হতে গড়াই যে এল এক ভাণ্ড
ক্ষণেক পরেতে ভাঁড় যেই গেল ফেটে।
তেই ঝট বাহিরিল লোক বেঁটে বেঁটে।
অবোধ ভাষায় তারা প্রাণকথা বলে।...’

এগুলি সবই দ্বাদশ সংখ্যায় (৮ই কার্তিক, ১৩৩১) প্রকাশ হয়। এই ভাবে ভিন্ন আদর্শের সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা করে যায় ‘শনিবারের চিঠি’ দল।

৬

‘শনিবারের চিঠি’র নজরুল বিদ্বেষের পিছনে ব্যক্তিগত কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয় নে। ভিন্ন সাহিত্যাদর্শের জন্যেই নজরুলের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে তাঁরা। এই আক্রমণ অনেকটা ব্যক্তির সঙ্গে দুই পত্রিকাগোষ্ঠীর। এই ধরনের আক্রমণ চালিয়েছিলেন কল্লোল গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। তবে একথা স্বীকার্য যে, অনেক সময় তাঁরা সাহিত্য সমালোচনার গতি ছেড়ে ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হন। ফলে নজরুলের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ও আক্রমণাত্মক সমালোচনার যে ঝড় তুলেছিল ‘শনিবারের চিঠি’ — তার ফল হয় বিপরীত। নজরুল জনমানসে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে প্রবলভাবে। তবে শেষ দিকে ‘শনিবারের চিঠি’ ও নজরুলের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সম্প্রীতি অটুট ছিল। সবচেয়ে মজার বিষয় যে, সজনীকান্ত দাস নজরুল ইসলামকে নিয়ে প্যারোডি লিখেছিলেন সেই সজনীকান্ত দাস শেষ জীবনে আর্থিক দুরাবস্থায় পড়লে নজরুল তাঁকে তাঁর গামাফোনের অফিসে কাজ দেন। এমনকি সজনীকান্ত দাসের ‘ভাঙারী হুঁশিয়ার’ প্যারোডির সুর দেন স্বয়ং নজরুল ইসলাম।

তথ্যসূত্র:

১. ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’, বুদ্ধদেব বসু, ভূমিকা, এম সই সরকার, ১৯৭৩, পৃ. ১১
২. ‘সজনীকান্ত স্মরণে’, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ‘শনিবারের চিঠি’, ফাল্গুন, নাথ ব্রাদার্স, ১৩৮৮, পৃ. ১১২
৩. ‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’, মুজফ্ফর আহমদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৬৯ পৃ. ২১৬-২২৩
৪. বিশদে দ্রষ্টব্য ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়ির নিচের তলায় বসে কবিতাটি লেখা হয়। পেনসিলে লেখা। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রথম শোতা মুজফ্ফর আহমেদ। কবিতাটি লেখা হয়েছিল রাত জেগে। সকালে তাকে কবিতাটি শোনানো হয়। পরে বেলা হলে ‘মোসলেম ভারত’এর (সম্পাদক মোজাম্মেল হক) আফজালুল সাহেব বাড়িতে এলে তাকে নজরুল কবিতাটি শোনান। সেই দিনই ‘বিজলী’র অবিনাশদা বা শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য শুনেন তাঁর কবিতার কপি নিয়ে যায়। ফলে ‘মোসলেম ভারত’এর আগে বিজলীতে ১৯২২ সালের ৬ জানুআরি মাসে (২২শে পৌষ, ১৩২৮) ছাপা হয় ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি। আর ‘বিজলী’ পত্রিকার ঠিক আট মাস পরে কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ‘মোসলেম ভারত’তে ছাপা হয়। কবিতাটি নজরুল নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ‘গুরুজী গুরুজী’ বলে চৈঁচিয়েছিলেন। এই কবিতা শোনার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বুক চেপে ধরেছিলো।... মুজফ্ফর আহমদ, ‘কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৬৯ পৃ. ২৩৬-২৪১
৫. ‘আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড)’, সজনীকান্ত দাস, নাথ পাবলিশিং, প্রথম নাথ পাবলিশিং সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১১৬
৬. ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সঙ্গে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী নজরুলের কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তিনি ‘মোসলেম ভারতে’ (কার্তিক, ১৩২৭) নজরুলকে নিয়ে লেখেন ‘সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি’ নামে কবিতা লেখেন। নজরুলের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথকে দৃষ্টি আকর্ষণ তিনিই। শান্তিনিকেতনে নজরুল ও শহীদুল্লাহ এলে তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। তাঁর ভ্রাতা নিশিকান্ত রায়চৌধুরী ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ সালে ‘আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল’ প্রবন্ধ লেখেন। দ্র। কাজী নজরুল ইসলাম ; জীবন ও সাহিত্য, রফিকুল ইসলাম, পৃ. ৬২
৭. ‘আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড)’, সজনীকান্ত দাস, নাথ পাবলিশিং, প্রথম নাথ পাবলিশিং সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১১৬
৮. বিদ্রোহ সংখ্যা কোনো পাবলিক লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় না। ‘দ্রোণ-গুরু’ ১৬২ লাইনের কবিতা। মুজফ্ফর আহমদ ‘দ্রোণ-গুরু’ কবিতাটি নজরুলের বড়ো ছেলে সব্যসাচীর মাধ্যমে সজনীকান্তের পুত্র শ্রীরঞ্জনকুমার দাসকে অনুরোধ জানায়। শেষে তাঁর বাড়ি গিয়ে মুজফ্ফর আহমদের এক বন্ধু তা কপি দেয়। আজহার উদ্দীন খানের ‘বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল’ এবং ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের ‘নজরুল চরিত মানস’ গ্রন্থে যে দশটি লাইন উদ্ধৃতি করা হয়েছে তা আসলে সজনীকান্ত দাসের ‘আত্মস্মৃতি’ গ্রন্থের থেকেই নেওয়া।

নজরুল বিদূষণে ‘প্রবাসী’ ও ‘শনিবারের চিঠি’

‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’, মুজফফর আহমদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৬৯, পৃ. ২৭৯

লেখক পরিচিতি: মিঠুন দত্ত, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দ চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ।